পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন ভারতে লিখনের উপাদান, লিখনশিল্পী ও গ্রন্থাগার

লিখনের উপাদান :-

অভিলেখ রচনার উপাদান অর্থাৎ অভিলেখ যেসব আধারের ওপর খোদাই করা হত, যেমন- পাথর, বিভিন্ন ধাতু, মৃত্তিকা ইত্যাদি তাদের কথা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এখন প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবর্ষে লিখনের জন্য অথবা আঁচড় কেটে লেখার জন্য যেসব উপাদান ব্যবহার করা হত সেগুলি নিম্নে আলোচিত হল-

(১) তালপত্র বা Palmyra Leaves– সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার সাহিত্যিক গ্রন্থের পুথি, চিঠিপত্র, অভিলেখ খোদাই করার পূর্বে রচিত খসড়া ইত্যাদি লেখার জন্য তালপত্রের ব্যবহার ছিল বহুল। খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকের কুরুদ শাসন থেকে জানা যায় যে- রাজকীয় দানপত্র তালপাতাতে লিখেই দানপ্রাপককে দেওয়া হয়েছে। বৃহৎ পাতাযুক্ত তাল বা তাড় অর্থাৎ Borassus flabelliformis এবং দাক্ষিণাত্যে প্রাপ্ত তালী বা তাড়ী অর্থাৎ Coryfa umbraculifera বা Coryfa taliera- লেখার কাজে এই দু'ধরনের তালপত্রেরই ব্যবহার হত। তালপত্রকে লম্বালম্বি সংযোগস্থল থেকে মাঝখান দিয়ে আলাদা করে ও দুই প্রান্তে প্রয়োজনমত কেটে নিয়ে লেখার উপযোগী করে তৈরী করা হত। পদ্ধতি ছিল এইরকম- প্রথমে শুকিয়ে, তারপর জলে বহুক্ষণ ভিজিয়ে বা ফুটিয়ে ও শেষে আবার শুকিয়ে নিয়ে দু পিঠে শাঁখ বা কড়ি বা মসৃণ পাথরের টুকরো ঘষে ঘষে মসৃণ করা হত। উত্তর ভারতে এর ওপর সাধারণত কালি ও কলম দিয়ে লেখা হত ও দক্ষিণ ভারতে তীক্ষ্ণাগ্র সূচ দিয়ে খোদাই করে কালি লেপে লেখাকে ফুটিয়ে তোলা হত। রাজশেখরের *কাব্যমীমাংসায়* বলা হয়েছে - তাড়ীপত্র ও বার্চ-ত্বকে কলম ও কালি দিয়ে লেখা হত। পাতাগুলোকে সমান দৈর্ঘ্যে কেটে উপরে ও নিচে কাঠের পাটা দিয়ে সাজিয়ে রাখা হত। এরপর পুথির মাঝখান দিয়ে ছিদ্র করে সুতো দিয়ে বাঁধা হত। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে পণ্ণ বা পর্ণ কে লিখনের একটি জনপ্রিয় উপাদান বলা হয়েছে। এই উল্লেখ যে তালপাতাকেই নির্দেশ করছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

Scanned with CamScanner

চৈনিক পরিব্রাজক সুয়ান জাং সপ্তম শতাব্দীতে সমগ্র ভারতবর্ষে লেখার উপাদান রূপে সাধারণভাবে তালপাতার উল্লেখ করেছেন। লিখনের উপাদান হিসেবে তালপাতার জনপ্রিয়তার জন্য প্রাচীন তাম্রপট্টগুলি অনেকসময় তালপাতার আকারেই কাটা হত। বৌদ্ধ ঐতিহ্যানুসারে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ঠিক পরেই তালপত্রে শাস্ত্র রচিত হয়েছিল। খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকের নাটকের একটি অংশ লেখা পুথি হল তালপত্রে লেখা প্রাচীনতম পুথি।

(২) বার্চ ও অ্যালো ত্বক (ভূর্জপত্র, অগুরু ত্বক)- বস্তুত ভূর্জপত্র হল ভূর্জ বা বার্চ গাছের ছালের অভ্যন্তর ভাগ। হিমালয়ে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। লেখার কাজে ভূর্জপত্র প্রথমে ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকেই ব্যবহৃত হত, পরে এর ব্যবহার ভারতের অন্যান্য অংশে এমনকি মধ্য এশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভারতে তালপাতার প্রাচুর্য থাকায় ভূর্জপত্রের ব্যবহার কমই হত। অলবিরুণী একে তূজ (tūz) গাছ বলছেন। তাঁর বর্ণনায় বার্চ একগজ লম্বা ও হাতের ছড়িয়ে দেওয়া আঙুলের মাপে চওড়া বা তার চেয়ে একটু কম। এতে তেল মাখিয়ে পালিশ করা হত, যাতে শক্ত ও মসৃণ হয় এবং তারপরে লেখা হত। তালপত্রের মতই এর মাঝখানে ছিদ্র রাখা হত এবং সুতো দিয়ে বাঁধা হত। কখনো আবার লেখা ভূর্জপত্রগুলিকে একসাথে করে একটি বস্ত্রখণ্ড দিয়ে জড়িয়ে দুটি শক্ত পাটাতন দিয়ে বেঁধে রাখা হত। Q. Curtiusও ভূর্জত্বকের উপর লেখার উল্লেখ করেছেন। ভূর্জের সমার্থক শব্দ 'লেখন', যার অর্থ লেখা বা লিখিত নথি। উত্তর ভারতে চিঠিপত্র লেখার কাজে ভূর্জপত্র ব্যবহৃত হত। মোগল আমলে কিছু কাশ্মীরী ভূর্জপত্রের পুথি চামড়া দিয়ে বাঁধা হত। অদ্যাবধি প্রাপ্ত প্রাচীনতম ভূর্জপত্রের পুথি হিসেবে খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে খোটানে প্রাপ্ত খরোষ্ঠী লিপিতে রচিত প্রাকৃত *ধম্মপদ* এর পুথি উল্লেখ্য।

অগুরু বা অ্যালো অর্থাৎ Aquilaria agallocha হল অ্যালো বৃক্ষের ভেতরের ছাল। অসমে 'সাচি' নামে পরিচিত এই উপাদান উত্তর-পূর্ব ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় পুথি-উপাদান। অসমে এই ত্বক থেকে তৈরী পাতাগুলিকে 'সাচিপাত' বলা হত।

(৩) বস্ত্র ও পশুচর্ম– প্রাচীনকাল থেকেই সুতির বস্ত্রে লেখার চল ছিল, এমনকি বর্তমানেও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সুতির বস্ত্রখণ্ডে লেখার প্রচলন আছে। সুতির বস্ত্রখণ্ডকে *পট, পাট, কার্পাসিক পট* প্রভৃতি বলা হত। এগুলি লেখার জন্য প্রয়োজনমত কেটে নেওয়া হত। চাল বা গম চূর্ণের প্রলেপ তৈরি করে এতে লাগানো হত। তারপর শাঁখ বা কড়ি ঘষে ঘষে তা মসৃণ করা হত। রাজস্থানে জ্যোতিষীরা ছবি আঁকা

Scanned with CamScanner

পঞ্জিকা তৈরির জন্য এইরকম বস্ত্র ব্যবহার করতেন। মহীশূরের বণিকরা হিসাব রাখার জন্য এইরকম বস্ত্রের উপর তেঁতুল বিচির চূর্ণ থেকে তৈরী প্রলেপ লাগাতেন। তারপর কাঠকয়লা দিয়ে কালো করতেন। এগুলিকে **কদিতম্** বা **কদতম্** বলা হত। এগুলির ওপরে চক বা সাজিমাটির তৈরী পেন্সিল দিয়ে লেখা হত, যাতে লেখাটি সাদা বা কালো হয়। শৃঙ্গেরি মঠে বস্ত্রে লিখিত গ্রন্থের বহু পুথি সংরক্ষিত আছে। গুজরাটের অনহিলবাদ পাটনের একটি জৈন গ্রন্থাগারে ৯৩ টি বস্ত্রখণ্ড সমন্বিত (প্রত্যেকটি ১৩ ইঞ্চি লম্বা, ৫ ইঞ্চি চওড়া)একটি পুথি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খ্রিঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর শেষে ভালোভাবে পিটিয়ে তৈরি করা কাপড়ে ভারতীয়রা লিখত বলে Nearchos উল্লেখ করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন রাজশাসনপট অর্থাৎ কার্পাস বস্ত্রে বা তাম্রপট্টে লেখা হত। রেশম পত্রে (Silk) লেখার প্রমাণও আছে। মধ্য এশিয়ায় সিল্কে লেখা লেখ্য পাওয়া গেছে। জয়সলমীরের একটি জৈন গ্রন্থাগার থেকে সিল্কের ওপর কালি দিয়ে লেখা জৈন সূত্রের একটি তালিকাও পাওয়া গেছে।

প্রাকৃতিক ও উদ্ভিজ্জ উপাদানের প্রাচুর্য হেতু প্রাচীন ভারতে চামড়ার ব্যবহার খুব বেশী মাত্রায় হত না। তাছাড়া লেখনশৈলীর পবিত্র কাজে পশুর চামড়ার ব্যবহারকে নিষিদ্ধ মনে করা হত। তবে পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপে পার্চমেন্ট কাগজের (পশুচর্ম থেকে তৈরী কঠিন ও সমতল বিশিষ্ট উপাদান) ব্যবহার প্রাচীন ও মধ্যযুগে ছিল। ভারতে তা বিরল। অবশ্য বৌদ্ধ সাহিত্যে লেখার কাজে পশুচর্ম ব্যবহারের কথা আছে। সুবন্ধুর *বাসবদত্তায়* লেখার জন্য অজিনের (হরিণ বা বাঘের চামড়া) উল্লেখ আছে। মধ্য এশিয়ায়ও চামড়ার ওপর লেখা লেখ্য পাওয়া গেছে।

(৪) **কাগজ**- সাধারণতঃ বিশ্বাস করা হয় যে, চীনারা প্রথম ১০৫ খ্রিস্টাব্দে কাগজ তৈরি করে। চীনা পর্যটকদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের কাগজের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ই-জিং ভারতীয় কাগজের উল্লেখ করেছেন। সংস্কৃত-চীনা অভিধানে (৮ম শতাব্দী) **শয়** কথাটি আছে যা চীনা tsie শব্দের সংস্কৃতায়িত রূপ। সেখানে **ককলি** বা **ককরি**-র কথাও আছে যা নিঃসন্দেহে Kaghaz (কাগ়জ়) থেকে সংস্কৃতায়িত। গ্রীক লেখক Nearchos ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সঙ্গী ছিলেন। তিনি লিখেছেন যে ভারতীয়রা সুতির বস্ত্র পিটিয়ে কাগজ তৈরী করত। কিন্তু তালপাতা বা ভূর্জত্বকের তুলনায় প্রাচীন ভারতে কাগজ জনপ্রিয় ছিল

Scanned with CamScanner

না। কাগজকেও তালপত্র ইত্যাদির মত কেটে মাঝে ফুটো করা হত। কখনো দুপাশেই কখনো চাল বা গম চূর্ণ জলে ফুটিয়ে প্রলেপ তৈরি করে দেওয়া হত। শুকিয়ে গেলে শাঁখ বা কড়ি ঘষে মসৃণ করা হত। ১২২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দে গুজরাতে কাগজে লেখা প্রাচীনতম অভিলেখ আবিষ্কৃত হয়েছে। M.A. Stein অবশ্য ১০৮৯ খ্রিস্টাব্দে অনুলিখিত শতপথব্রাহ্মণের একটি কাশ্মীরীয় পুথির উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষের জলবায়ুগত কারণে কাগজে লেখা পুথি বেশিদিন স্থায়ী হয় না।

(৫) কাঠ- শ্লেটের আগে চারপায়া ফলক বা তক্তা বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হত। কাদা বা চক লাগিয়ে ঐ কাঠের শ্লেটের উপর ইটের গুড়ো সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হত। তার ওপরে ভেজা যষ্টির সাহায্যে সংখ্যা ইত্যাদি লেখা হত। এই লেখনীকে **বর্তনা** বা **বর্থা** (রাজস্থানে) বলা হত। *বিনয়পিটকে*-র কিছু অংশ কাষ্ঠফলকে ও বাঁশের কঞ্চিতে লেখা হয়েছে। *জাতক*গুলিতেও ফলক নামে কাঠের ফলকের উল্লেখ আছে, এটিকে শিশু শিক্ষার্থীরা বর্ণমালা শেখার জন্য ব্যবহার করত। বাঁশের শলাকাতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নাম খোদাই করা থাকত এবং সেগুলি তাদের পরিচয় পত্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। ক্ষহরাত নহপানের একটি অভিলেখ থেকে গিল্ড এর সভাকক্ষে একটি কাঠের ফলকে লিখিত ঋণ সংক্রান্ত চুক্তির কথা জানা যায়। কিছু ধর্মীয় বিষয় ও সাহিত্যও কাষ্ঠফলকে লেখা হত। বিশেষ করে উত্তর ভারতে দরিদ্র মানুষেরা ধর্মীয় উপদেশ কাঠের বোর্ডে চক দিয়ে লিখে রাখত। এমনকি বর্তমান সময়ে শিশুরা লেখাপড়ার জন্য, জ্যোতিষীরা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাদের কাজে কাঠের বোর্ড ও চক ব্যবহার করে।

লিখনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী

(১) কালি- লেখার জন্য ব্যবহৃত নরম উপাদান, যেমন- তালপাতা, ভূর্জত্বক, কাগজ, কাপড়, চামড়া প্রভৃতিতে কালি দিয়ে লেখা হত। লেখার জন্য ব্যবহৃত কালিকে সংস্কৃতে **মষি,মষী, মসি,মসী, মেলা** ইত্যাদি বলা হত। কালি রাখার পাত্র অভিহিত হত **মসী-ভাজন, মেলামন্দা, মেলাধু, মেলাঙ্কুকা, মষিমণি, মষিপাত্র, মষিভাণ্ড, মষিকূপিকা** ইত্যাদি নামে।

লেখার কালি দ্বিবিধ – **স্থায়ী** ও **অস্থায়ী** (ধুয়ে ফেলার যোগ্য)। প্রথমটি পুথি লেখার জন্য, দ্বিতীয়টি চিঠিপত্র ও দোকানের হিসাবখাতা লেখার জন্য ব্যবহৃত হত। সেগুলি আবার বিভিন্ন রঙের হত। প্রদীপের কালি এবং খয়েরের আঠা মিশিয়ে সস্তার কালি তৈরী করা হত। কখনো আবার প্রদীপের কালি ও কাঠকয়লার সঙ্গে আঠা, চিনি ইত্যাদি ও জল মিশিয়েও এই ধরনের কালি তৈরি করা হত।

Scanned with CamScanner

স্থায়ী কালো কালি তৈরীর জন্যপিপল গাছের আঠা ভালোভাবে পিষে তাতে জল মিশিয়ে মাটির পাত্রে কিছু সময় রাখতে হবে তারপর আগুনে ফুটিয়ে ফোটানোর সময়ই কিছুটা মিহি করে গুঁড়ানো Boraxও লোধ্র মেশাতে হবে। পরে তা কাপড়ে ছাঁকতে হবে। একে বলা হত **অলক্ত** (>আলতা, রমণীরা শরীরের বিভিন্ন অংশ, বিশেষত ঠোঁট ও পা রং করত)। এর সঙ্গে প্রদীপের কালি (প্রদীপে তিল তেল দিয়ে তৈরি) বিশেষভাবে মিশিয়ে কালো রঙের তরল তৈরি করা হত। রাজস্থানে এই ভাবে কালো কালি তৈরির পদ্ধতি কিছুদিন আগেও ছিল। ভূর্জপত্রে (ভূর্জত্বকে) লেখার জন্য কাঠবাদামের পোড়ানো ভূষির চূর্ণ গোমূত্রে ফুটিয়ে নেওয়া হত।এই কালি জলে ধুয়ে যেত না ।

রঙিন কালির মধ্যে **লাল কালি** সবচেয়ে জনপ্রিয়। অলক্ত অনেক সময় লেখার জন্য ব্যবহৃত হত। এছাড়া সিঁদুর ও আঠা জলে গুলেও লাল কালি তৈরি হত। পুথিতে বিশেষ বিশেষ শব্দবন্ধ বা সন্দর্ভ (যেমন অধ্যায়ের পুষ্পিকা) লেখার জন্য বা লেখক যেগুলিকে বেশি গুরুত্ব দিতে চাইতেন, সেখানে লাল কালিতে লেখা হত। **সবুজ কালি** তৈরী হত সবুজ রং ও আঠা ফুটন্ত জলে মিশিয়ে।হলুদ কালি পীত হরিতাল থেকে একই ভাবে প্রস্তুত করা হত। কোনো অক্ষর বা অক্ষরসমূহ মোছার জন্য **হলুদ কালি** দিয়ে গোল চিহ্ন করে বা ছোট ছোট এক বা একাধিক উল্লম্বরেখা দিয়ে অক্ষরের উপর দিকে দাগ দেওয়া হত। এগুলি অনেক সময় রঙিন কালি দিয়েও হত। চক, সীসা বা হিঙ্গুলও কালির বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হত। **স্বর্ণাভ** ও **রৌপ্যাভ কালি** সোনা বা রূপার চূর্ণ ফুটন্ত জলে আঠার সঙ্গে মিশিয়ে বানানো হত। সাধারণত চিত্রকররা এই দামি কালি ব্যবহার করতেন। তবে কখনো চিঠি বা পুথি লেখার কাজে ধনীদের দ্বারাও ব্যবহৃত হত।

Nearchos এবং Curtius বস্ত্র ও ভূর্জত্বকে লেখার উল্লেখ করেছেন বলে বোঝা যায় ভারতীয়রা কালির ব্যবহার খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকেই করত। লিপি শব্দটি লিপ্ ধাতু থেকে এসেছে এবং খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পাণিনির গ্রন্থে উল্লিখিত। কিছু অভিলেখও খ্রিস্টজন্মের আগে কালিতে লেখার বিষয়ে প্রমাণ দেয়। অশোকের অভিলেখে লব্ধ ব্রাহ্মী লিপিতে বিন্দু দিয়ে অক্ষরের ফাঁস(loop) বোঝানো হত। তাই এর থেকে বোঝা যায় যে অভিলেখ খোদাই করার সময় কালির ব্যবহার হত। খ্রিস্ট জন্মের আগে দেহাবশেষ ধারক স্মারক পাত্রে কালিতে লেখা একটি লেখ্য অস্ত্রের অঞ্চলে ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া গেছে। এটিই কালিতে লেখা *ধম্মপদের* অন্যতমপ্রাচীন পুথি। ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাথরের ওপর কালিতে লেখা লেখ্যও পাওয়া যায়। অভিলেখ খোদাই করার পূর্বে পাথরের গায়ে

Scanned with CamScanner

চক ও কালি দিয়ে প্রথমে লিখে নেওয়া হত, তাই কোথাও কোথাও কালি বা অঙ্কনের চিহ্ন দৃশ্যমান।

(২) কলম ও অন্যান্য সাধন- লেখার জন্য বা অভিলেখ উৎকীর্ণ করার জন্য যেসব বস্তু ব্যবহৃত হত, তাদের সব কিছুর সাধারণ নাম হল 'লেখনী' (লেখার সাধন বা instrument)। এই শব্দটির দ্বারা স্টাইলাস, পেনসিল, ব্রাশ (তুলি), কলম সবকিছুকে বোঝায়। লেখন বলতে যেমন কোনো কিছু লেখাকে বোঝায়, তেমনি উৎকীর্ণ করা বা অঙ্কন করাকেও বোঝায়। তাই 'লেখনী' এই সাধারণ নাম ব্যবহারের যৌক্তিকতা আছে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে 'বর্ণিকা' শব্দের দ্বারা কাঠের তৈরি কলমকে বোঝানো হত, যেটির প্রান্তের দিকে ছুঁচলো কোনো চেরা নেই। 'বর্ণিকা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল অক্ষর সৃষ্টিকারী (maker of a letter) । বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বোর্ডে অক্ষর লেখার জন্য এর ব্যবহার করত। 'ইষিকা বা ইষীকা' হল নল বা বাঁশের শাখা থেকে তৈরি এক ধরনের কলম। পুথির লেখকরা এগুলি ব্যবহার করতেন। *দশকুমারচরিতের* দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে উল্লিখিত 'বর্ণবর্তিকা' একরম ব্রাশ বলে মনে করা হয়, তবে তা রংপেনসিলও হতে পারে। 'কলম' শব্দটি গ্রীক থেকে আরবির মাধ্যমে সংস্কৃতে গৃহীত মনে হয়। ৮ম শতাব্দীর সংস্কৃত- চীনা অভিধানে এটি সংস্কৃত শব্দ বলে গৃহীত। Stylus হল তালপাতায় 'লেখা'র জন্য অর্থাৎ খোদাই করার জন্য ধাতুর তৈরি তীক্ষ্ণাগ্র শলাকা বিশেষ। বিভিন্ন অঞ্চলে এর বিভিন্ন নাম। কখনো আবার কালিতে লেখা তালপাতার পুথির শেষে স্টাইলাস দিয়ে অঙ্কন করা হত। রাজশেখরের *কাব্যমীমাংসায়* একে বলা হয়েছে 'লোহ-কণ্টক' যা 'তাল-দল' লেখার কাজে ব্যবহার করা হত। 'কিট্টলেখনী' শব্দটিও Stylus বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিট্টলেখনী শব্দটি অবশ্য মনে হয় যেকোনো কঠিন পেন্সিলের মত লেখনীর ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হত। অভিলেখ যেহেতু শক্ত কোনো জায়গায় খোদাই করা হত, তাই সেখানে Stylus, Chisel (ছেনি-বাটালি), হাতুড়ি প্রভৃতি অন্যান্য উপকরণ প্রয়োজন হত। সংস্কৃততে 'শলাকা' শব্দ দ্বারা অভিলেখে ব্যবহৃত Stylus কে বোঝানো হয়েছে। 'তুলি' বা 'তুলিকা' শব্দ সাধারণত ব্রাশ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। লাইন সোজা করার জন্য একধরনের স্কেল ব্যবহার করা হত, যাকে 'কাম্বী' বা 'কম্বা' বলা হত। পুথি লেখকরা সোজা লাইন টানার জন্য 'রেখাপতি' বা 'সমাসপতি' নামক একটি কাঠের একটি জিনিস ব্যবহার করতেন, এর কেন্দ্র থেকে সমান দূরত্বে কয়েকটি সুতো জোড়া থাকত।

Scanned with CamScanner

লিখনশিল্পী :

প্রাচীন ভারতে নরম কোনো উপাদানের ওপর কালি দিয়ে লেখা এবং কঠিন কোনো বস্তুর ওপর খোদাই করা – উভয়েই প্রচলিত ছিল। রাজকীয় দানপত্র বা শাসনগুলো সাধারণত কোনো ক্ষণস্থায়ী বস্তুতে লেখা হত, তারপর তা তাম্রপট্টে অথবা পাথরে খোদাই করা হত। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবর্ষে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদেরই অধিকার ছিল। তাই বহুকাল যাবৎ লিখনের শিল্পকলাতেও ব্রাহ্মণরাই তাদের অধিকার কায়েম রেখেছিল। ধীরে ধীরে সমাজের বিস্তৃতি ও বিবর্তনের ফলে 'লিখন' একটি পেশা হিসেবে জায়গা করে নিতে থাকল। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে এরূপ অনেক নিদর্শন আছে যে প্রাচীনকাল থেকেই পেশাগত এবং জাতিগত দিক থেকে লেখকদের অস্তিত্ব ছিল। লিখনশৈলীর সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের কাজের পার্থক্য, পদ প্রভৃতি অনুযায়ী ভিন্ন নাম হত। সেগুলি নিম্নে আলোচিত হল —

(১) লেখক – লেখার কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রাচীনতম ও সাধারণ নাম হল 'লেখক'। এই শব্দটি একই অর্থে *রামায়ণ* ও *মহাভারতে*ও উল্লিখিত হয়েছে। *বিনয়পিটকে* লিখনের পেশাকে প্রশংসা করা হয়েছে। *মহাবগ্গ* ও *জাতক* প্রায়শই সরকারি চিঠিপত্রের কথা বলে, যেখানে লেখকের বিশেষ কৌশল ও জ্ঞানের প্রয়োজনের বিষয়ে বলা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকেই 'লেখক'দের অস্তিত্ব ছিল। উত্তরকালীন সাহিত্যে অবশ্য 'লেখক' শব্দটি পেশাদার লেখক তথা যেকোনো সাধারণ লেখক বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।

আভিলেখিক প্রমাণের মধ্যে সাঁচী অভিলেখে (স্তূপ ১, নং – ১৪৩) 'লেখক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে দাতা পেশার দিক থেকে লেখক। এখানে Bühler 'লেখক' শব্দটির অনুবাদ করেছেন 'Copyist of MSS' (Manuscripts), (*Indian Palaeography*, page–149)। পরবর্তীকালের অনেক অভিলেখে 'লেখক' বলতে বোঝাত তাম্রপট্টে বা প্রস্তরে দলিল বা দানপত্র উৎকীর্ণ হওয়ার পূর্ব সেই বিষয়ের খসড়া প্রস্তুতকারীকে। কিন্তু পরবর্তীকালে এবং বর্তমানেও 'লেখক' বলতে সর্বদাই পুথির অনুলিখনকারী ব্যক্তিকে বোঝায়। সাধারণতঃ ধার্মিক ও নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণেরা এবং কখনো দরিদ্র, রিক্ত কায়স্থরা মন্দির, গ্রন্থাগার প্রভৃতি জায়গায় এই কাজে নিযুক্ত হত। বিশেষ করে জৈন পুথির অনুলিখন করানোর জন্য অনেক জৈন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি এদের কাজে নিয়োগ করতেন। কখনো সাধু, সাধ্বী এবং শিক্ষার্থীরাও পুথির প্রতিলিপি তৈরীর কাজ করেছে –

Scanned with CamScanner

এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়। একই রকমভাবেই নেপালে বৌদ্ধ পুথির অনুলিখন করার জন্য ভিক্ষু, ভিক্ষুণী প্রভৃতিরা যুক্ত থাকত।

(২) লিপিকর বা লিবিকর– খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে লেখার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে 'লেখক' ছাড়াও 'লিপিকর', 'লিবিকর' অথবা 'দিপিকর' বলা হত। সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থ *অমরকোষে* লেখকের পর্যায়শব্দ রূপেই 'লিপিকর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অশোকের অনেক অনুশাসনে এই শব্দগুলির ব্যবহার আছে। যেমন – 'পডেন লিখিতং লিপিকরেণ' (Brahmagiri Minor Rock Edict No. 2) ; 'দিপিকর' (Rock Edict No. 14, Shahbazgarhi Version)। কিন্তু অশোকের অভিলেখে লিপিকর শব্দটি লেখক ও খোদাইকর উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়। সুবন্ধু রচিত *বাসবদত্তাতেও* 'লিপিকর' শব্দটি লেখককে নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়েছে। রাজার দ্বারা নিযুক্ত লেখকরা রাজলিপিকর নামে অভিহিত হতেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় — একটি সাঁচী অভিলেখে দাতা সুবহিত গোতিপুত এর পরিচয় হল — তিনি রাজলিপিকর। অর্থাৎ, সাহিত্যিক ও অভিলেখিক উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে – 'লেখক' শব্দটির তুলনায় 'লিপিকর' শব্দটির প্রয়োগ কম এবং মূলত 'অনুলিপিকর' এবং 'খোদাইকর' অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

(৩) দিবির– লেখক অর্থে 'দিবির' শব্দটিরও ব্যবহার চোখে পড়ে। ৫২১-৫২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভারতের গুপ্ত অভিলেখে এর প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। সপ্তম ও অষ্টম শতকের বলভী অভিলেখগুলিতে কোনো 'সান্ধিবিগ্রহিক' (সন্ধি ও যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রী) নথির খসড়া তৈরীর কাজে যুক্ত থাকায় তিনি 'দিবিরপতি' বা 'দিবীরপতি' উপাধি প্রদত্ত হয়েছেন। 'দিবিরপতি' এই উপাধি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অনেক দিবির বা লেখক ছিলেন এবং তাদের মধ্যে সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন প্রধান। Bühler মনে করেন, 'দিবির' বা 'দিবীর' শব্দটি পার্সী শব্দ 'দেবীর্' (অর্থ – লেখক) থেকে এসেছে। সাসানীয়দের সময় পারস্য ও পশ্চিমভারতের মধ্যে বাণিজ্যে সুসম্পর্কের জেরে শব্দটির অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়েছে (*Indian Palaeography*, Page-101)। দিবির শব্দটির ব্যবহার খ্রিস্টিয় একাদশ-দ্বাদশ শতক অবধিও প্রচলিত ছিল। *রাজতরঙ্গিণী* ও সমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– ক্ষেমেন্দ্র রচিত *লোকপ্রকাশ* গ্রন্থে 'দিবির'দের বিভিন্ন উপবিভাগের উল্লেখ আছে। যেমন– 'গঞ্জদিবির' (রাজার লেখক), 'নগরদিবির' (নগর লেখক), 'গ্রামদিবির' (গ্রাম্য লেখক) ইত্যাদি। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 'দিবির' শব্দটির ব্যবহার ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল।

Scanned with CamScanner

(৪) কায়স্থ – পেশায় বা জাতে লেখক শ্রেণিকে বোঝাতে 'কায়স্থ' শব্দটি ব্যবহার করা হত। *বিষ্ণুধর্মসূত্রে* এই শব্দটি রাজার দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তি, যে কাগজপত্র লেখা ও নথি প্রস্তুতে নিয়োজিত থাকত, তাকে বোঝাতে প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখা যায় যায়। *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতেও* 'কায়স্থ' শব্দটির উল্লেখ আছে। টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর শব্দটির অর্থ করেছেন লেখক এবং গণক (হিসাবরক্ষক) বুধগুপ্তের সময়কালে দামোদরপুর তাম্রশাসনে (খ্রিঃ ৪৭৬-৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ) 'কায়স্থ' শব্দটির ব্যবহার আছে। ৭৩৮–৭৩৯ খ্রিস্টাব্দের রাজস্থানের কণস্বা অভিলেখে এবং পরবর্তীকালে গুজরাত ও কলিঙ্গ থেকে প্রাপ্ত বহু তাম্রশাসনে 'কায়স্থ' শব্দটির ব্যবহার আছে। কল্‌হনের *রাজতরঙ্গিণী* এবং ক্ষেমেন্দ্রের *লোকপ্রকাশ* গ্রন্থে 'কায়স্থ' শব্দটির বহুল ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত কাশ্মীরে কায়স্থদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল।

শুরুতেই 'কায়স্থ' একটি জাতি বা বর্ণ হিসেবে পরিগণিত হত না। তারা বিভিন্ন বর্ণের, শ্রেণির মানুষ ছিল এবং মন্ত্রিদের দপ্তরে কাজে নিয়োজিত থাকত। ধীরে ধীরে তারা একটি শ্রেণি এবং পরে জাতিতে পরিণত হয়েছে। এদের সমাজে যথেষ্ট প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী ছিল। যদিও ব্রাহ্মণ্য পরিসরে এরা ছিল শূদ্রদের সাথে বৈবাহিক কারণে মিশ্রণের কারণে শূদ্রদের সমকক্ষ।

(৫) করণ, করণিক, করণিন্, শাসনিন্ এবং ধর্মলেখিন্- ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে 'কায়স্থ' ছাড়া লেখক কেরাণীদের অন্যান্য উপাধি ছিল 'করণ', 'করণিক', 'করণিন্', 'শাসনিন্' ও 'ধর্মলেখিন্'। 'করণ' শব্দটি কায়স্থ শব্দের পর্যায়। স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে 'করণ'কে মিশ্র জাতি হিসেবে বলা হয়েছে। অনেকে বলেন 'করণ' কোনো জাতি নয়, তা কেবলমাত্র একটি উপাধি। 'করণিক' শব্দটি কোনো পৃথক শ্রেনীকে নয়, একদল সরকারি লেখকদের বোঝাতে ব্যবহৃত হত। 'করণিন্', 'শাসনিন্' এবং 'ধর্মলেখিন্' শব্দগুলি কোনো কার্যালয়ের (office) লেখকদের বোঝাত। 'করণিন্' শাসক বা উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের আদেশ শুনে লিপিবদ্ধ করতেন এবং 'শাসনিন্' আইনি নথিপত্র লিখতেন। Kielhorn 'করণ'কে মিশ্র জাতি হিসেবে বুঝিয়েছেন এবং শব্দটির অনুবাদ করেছেন-'Writer of legal documents' অর্থাৎ আইনি কাগজপত্রের বা নথির লেখক। তাম্রশাসনে Scribe বা খনক হিসেবেই 'করণ' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়।

(৬) শিল্পিন্, রূপকার, সূত্রধর এবং শিলাকূট – পাথর এবং ধাতুর উপাদানে অক্ষর খোদাইকারী ব্যক্তিদের 'শিল্পিন্', 'রূপকার', 'শিলাকূট' প্রভৃতি নামে

Scanned with CamScanner

অভিহিত করা হয়। আভিলেখিক সূত্র থেকে জানা যায় যে – উৎসর্গমূলক বা স্মৃতিমূলক প্রশস্তিকার্য বা দানের অভিলেখ খোদাইর পূর্বে তা কোনো কবি বা অন্য রচয়িতারা রচনা করতেন, তারপর তার একটি স্বচ্ছ ও চূড়ান্ত খসড়া কোনো পেশাগত লেখক প্রস্তুত করতেন। অবশেষে তা কোনো খনক (engraver or mason) কে দেওয়া হত নির্দিষ্ট আধারের উপর খোদাই করার জন্য। Bühler এর বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে – খোদাইকর চূড়ান্ত খসড়া হাতে পেয়ে কোনো পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে প্রথম এঁকে নিতেন এবং তারপর তা খোদাই করতেন। (Indian Palaeography, Page – 101)। এই নিয়মের ব্যতিক্রমও অনেকসময় দেখা যেত। যেমন – কখনো রচয়িতা খনকের কাজ করতেন আবার কখনো খনকই চূড়ান্ত খসড়া তৈরী করতেন। অভিলেখ উৎকীর্ণ করার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা সাধারণত কামার বা কর্মকার, লৌহকার, স্বর্ণকার, তাম্রকার প্রভৃতি পেশাগত জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ওড়িশাতে খোদাইকরদের 'অক্ষরশালিন্' ও 'অক্ষশালিক' (a person who belongs to a record house)বলা হত। মধ্যযুগীয় তাম্রশাসনে প্রায়ই খোদাইকরের নাম উৎকীর্ণ করা হত। সেখানে উৎকীর্ণ করা হয়েছে বোঝাতে 'উৎকীর্ণ' বা 'উৎকিলিত' (engraved) শব্দ ব্যবহৃত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খোদাইকর সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। মৌর্য সম্রাট অশোকের ব্রহ্মগিরি এবং সিদ্ধপুর অনুশাসনে **ছপড** নামক খনকের উল্লেখ আছে। খোদাইকরের নামোল্লেখ সংক্রান্ত এটিই অদ্যাবধি প্রাপ্ত প্রাচীনতম নথি। আদিত্যসেনের অফসড় অভিলেখে **সূক্ষ্মশিব**, পূর্ব চৌলুক্য বংশের রাজা নরেন্দ্র মৃগরাজের খনক **অক্ষরললিতাচার্য্য** এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রস্তরাভিলেখ থেকে জানা যায় যে, এটি বরেন্দ্র (উত্তর বাংলা) এর শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান **শূলপাণি** নামক বিখ্যাত শিল্পীর দ্বারা খোদাই করা হয়েছে। তাঁর প্রশাসনিক উপাধি ছিল **রাণক** । অভিলেখটির পরিষ্কার এবং সুন্দর খোদাই প্রশংসার্হ। তালগুন্দ অভিলেখটি যে প্রস্তরে খোদিত হয়েছে, কন্নড় দেশের কদম্ব রাজা শান্তিবর্মনের সভাকবি **কুব্জ** সেখানে লিখেছিলেন এবং এর ফলে খোদাইকর ত্রুটিহীনভাবে সুন্দর করে অভিলেখটি উৎকীর্ণ করতে পেরেছিলেন।

প্রায়শই অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তিরা অভিলেখ উৎকীর্ণ করার কাজে নিযুক্ত হত এবং এরফলে বহু অভিলেখে প্রচুর ভুল চোখে পড়ে। তবে, প্রভাবশালী রাজার কাছে অভিজ্ঞ ও দক্ষ খনকেরা কাজ করত বলে, রাজপ্রশস্তি সাধারণতঃ ত্রুটিহীন হত। আবার অনেকসময় ক্ষুদ্র শাসকপ্রধানেরা অভিলেখ উৎকীর্ণ করালে

Scanned with CamScanner

রাজশাসনেও ভুল দেখা যেত।অক্ষরের বিবর্তনের জন্য ব্রাহ্মণ পন্ডিত, জৈন, বৌদ্ধ সাধুপুরুষদের অবদান যেমন ছিল, তেমনি অক্ষরের রূপের বিবর্তনের জন্য লেখক ও লেখক শ্রেণি অবশ্যই বড় ভূমিকা পালন করেছে। আবার অক্ষরের ভিন্নরূপের জন্য প্রস্তর-খনক ও ধাতু খনকারাও দায়ী। কারণ- উপাদানের বৈশিষ্ট্যের জন্য অক্ষরে অনেকসময় কিছুটা হেরফের ঘটত।

গ্রন্থাগার :

প্রাচীন ভারতে গ্রন্থাগার সম্পর্কে নিম্নলিখিত আলোচনায় মূলত পুথি ও তাম্রশাসন সংরক্ষণের বিষয়টিতেই আলোকপাত করা উদ্দেশ্য। বর্তমানে পুথি তথা অভিলেখ সংরক্ষণের বিবিধ পন্থা তথা আধুনিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে ও অজস্র গ্রন্থাগার, সংরক্ষণালয় স্থাপিত হয়েছে। নিম্নের আলোচনা শুধুমাত্র প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাগার বিষয়ে সীমাবদ্ধ।

পুথি- প্রাচীনকালে পুথি লেখার পর তালপত্র বা ভূর্জপত্রর পুথির উপরিভাগে কাষ্ঠ ফলক দিয়ে সুতো দিয়ে বাঁধা থাকত। কাষ্ঠফলকের আকার তালপত্র বা ভূর্জপত্রর আকারেই হত। তা বর্তমানের পুথির ক্ষেত্রেও করা হয়ে থাকে। দক্ষিণভারতে এই কাষ্ঠ আবরণ সমেত পুথিতে ছিদ্র করা হত, যার মধ্য দিয়ে লম্বা সুতো প্রবেশ করিয়ে বাঁধা হত। এই লম্বা সুতো পুথিতে অনেকবার করে ঘুরিয়ে অবশেষে বাঁধা হত। এই পদ্ধতি প্রাচীনকালে খুব পরিচিত এবং জনপ্রিয় ছিল। পুথির 'সূত্রবেষ্টনম্' সম্পর্কে *হর্ষচরিত*-এও বলা হয়েছে। পশ্চিম ও উত্তর ভারতের যেসব প্রাচীন তালপাতার পুথি পাওয়া গেছে, সেগুলিতেও একই বিষয় লক্ষ করা যায়, নেপালে কিন্তু খুব মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ পুথিগুলি কখনো কখনো ধাতু (em-bossed metal) নির্মিত হত। পুস্তক বা পুথিগুলি যেগুলি এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হত, সাধারণত শুকনো রঙ করা বা চিত্রিত বস্ত্র দিয়ে মুড়ে সংরক্ষিত হত। জৈন গ্রন্থাগারগুলিতে কখনো কখনো তালপাতার পুথিশুভ্র সুতোর চটবস্ত্রে জড়িয়ে পুনরায় সাদা ধাতুর ছোটো বাক্সতে রাখা হত। সেই সংগৃহীত পুথিগুলি নথিভুক্ত করে রাখা হত, অথবা বৌদ্ধধর্মস্থান বা রাজসভায় কোনো গ্রন্থাগারিকের নিকট রাখা হত। মূলত কাঠের বা কাষ্ঠফলক নির্মিত বাক্সে এগুলি রাখা হত। কেবলমাত্র কাশ্মীরে পুথি চামড়াতে বেঁধে ও বইয়ের মত তাকে রাখা হত।

জৈনদের লেখা থেকে জানা যায় গ্রন্থাগারের প্রাচীন নাম 'ভারতীভাণ্ডাগার' (treasury of the goddess of speech) । বলা যেতে পারে এর বর্তমান সমার্থক শব্দ 'সরস্বতীভাণ্ডাগার'। এই সরস্বতীভাণ্ডাগার মন্দির, বিদ্যামঠ,

Scanned with CamScanner

বৌদ্ধধর্মস্থান যেমন - মঠ, উপাশ্রয়, বিহার, সঙ্ঘারাম প্রভৃতিস্থানে আবার কখনো রাজার সভায় অথবা কোনো ব্যক্তির বাড়িতে দেখা যায়। হেমাদ্রি তাঁর দানখণ্ড গ্রন্থে বলেছেন, পুরাণে অনুসারে ধনী ব্যক্তিদের মন্দির ও অন্যান্য স্থানে গ্রন্থ দান করা পবিত্র কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। জৈন ও বৌদ্ধদের কাছে এরূপ দানগুলি বাধ্যতামূলক ছিল এবং এই কাজটি তাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই সম্পন্ন করতেন। একাদশ শতকে ধারার রাজা ভোজের একটি রাজকীয় গ্রন্থাগার ছিল, যা মধ্যযুগে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। জৈন লেখক হেমচন্দ্রের লেখা থেকে জানা যায় যে ১১৪০ সালে মালব জয়ের পর এই গ্রন্থাগারটিকে সিদ্ধরাজ জয়সিংহ অণ্হিল্বাদে স্থানান্তরিত করেন। ত্রয়োদশ শতকের একটি লেখা আবার চৌলক্যদের রাজগ্রন্থাগারের সঙ্গে এর সংযুক্ত হবার কথা ঘোষণা করে। চৌলক্যরাজ বিশলদেব বা বিশ্বমল্ল (১২৪২-১২৬২ খ্রিঃ) এর ভারতীভাণ্ডাগার থেকে প্রাপ্ত একটি পুথিতে *নৈষধীয়চরিতের* পুথি পাওয়া যায়, যার ওপর বিদ্যাধর প্রথম টীকা লেখেন। যশোধর প্রণীত *জয়মঙ্গলা* টীকা সহ *কামসূত্রের* পুথিও পাওয়া যায়।

পুথির খোঁজে ভারতসরকারের আগ্রহের ফলে আলোয়ার, বিকানের, জম্মু, মাইসোর প্রভৃতি রাজকীয় গ্রন্থাগার থেকে বহু অপ্রকাশিত পুথি সম্পাদিত হচ্ছে। এইসব পুথির খোঁজে কিছু ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারেরও ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও যে প্রাচীনকালে গ্রন্থাগার বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে।

তাম্রশাসন- তাম্রশাসনগুলি দানপ্রাপক ও তাদের উত্তরসূরীদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান নথি ছিল। এগুলি কোনোভাবে হারিয়ে গেলে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলে তাদের প্রাপ্ত করমুক্ত ভূমি করযোগ্য ভূমিতে পরিণত হত। তালপাতায় লেখা শাসন এবং তাম্রপট্টে খোদাই করা ভূমিদানপত্র আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তা পুনরায় পরবর্তী শাসক দ্বারা জারি করার সময় প্রাপকের ভূমির সীমানা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে নরেন্দ্রর কুরুদ অভিলেখ এবং ভাস্করবর্মনের ডুবি ও নিধনপুর তাম্রশাসন উল্লেখ্য। তাই দাতার থেকে দান পেয়ে দানপ্রাপক খুব যত্ন করে সেই নথির সংরক্ষণ করতেন।

কৃত্রিম গুহাতে বসবাসকারী সাধুরা অনেকসময় করমুক্ত ভূমির নথি হিসেবে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের বিষয়বস্তু গুহার দেওয়ালে উৎকীর্ণ করে রাখতেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে দানগ্রহীতা বা প্রাপকরা যেভাবে তাম্রশাসনে বা তাম্রপট্ট সংরক্ষণ করত, তা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। বলভীতে কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে যেখান

Scanned with CamScanner

থেকে জানা যায় কোনো স্থানে দেওয়াল তুলে তাম্রপট্ট সংরক্ষিত হত। কখনো দানের ভূমির নীচে বা ইটের তৈরী গুপ্তস্থানে সেগুলি রাখা হত। এগুলি যিনি খুঁজে পেতেন তিনি নিয়ে নিতেন, বা দানপ্রাপক দরিদ্র ব্যক্তিরা সেগুলি বণিকদের বেচে দিতেন এবং সেগুলি প্রায়ই ইউরোপীয় সংগ্রহকারীদের হস্তগত হত। তাম্রশাসনটি অবশ্যই জারি করার স্থান থেকে অনেক দূরে পাওয়া যেত।

কখনো অনেক নথি একসঙ্গে সংরক্ষণ করে রাখা হত। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলম্ জেলার অন্ধ্রভরম্ গ্রামে একটি বৃক্ষতল সন্নিকৃষ্ট ভূমিতে খননের ফলে একটি ভস্মাধারে (urn) চার গুচ্ছ তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এই দানগুলি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন শাসক দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ তাদের মালিকেরা যখন গ্রাম ছেড়ে তীর্থে বা বাইরে যেতেন, তখন সেগুলি একসাথে জড়ো করে মাটির নীচে রেখে যেতেন। শাসনগুলিকে সমান্তরাল ভাবে রেখেতাদের সীল এর মুখগুলি একসঙ্গে করে একটি লোহার রড ঢুকিয়ে সেটি ভস্মাধারে রাখা হত। এবার পাত্রের মধ্যে ঘাস রেখে মুখটি গোলাকার একটি ঢাকা দিয়ে আবৃত করা হত। এভাবে সংরক্ষণের ফলে শাসনগুলি খুব ভালো অবস্থাতে পাওয়া গেছে।

কখনো শাসনগুলিকে সংরক্ষণের জন্য বিশেষভাবে তৈরী পাথরের বাক্স ব্যবহার করা হত। যাদব মাধবের কালেগাঁও প্লেটটি দুটি ফলকের দ্বারা জোড়া একটি পাথরের বাক্সে পাওয়া গেছে। বাক্সটির ওপরের ফলকটি ২২/১৫.৫/০ ইঞ্চি এবং নীচেরটি ২৪/১৬.৫/৭ ইঞ্চি মাপের। এদের মাঝে ৪.৫ ও ১.৫ ইঞ্চির ফাঁকা স্থান আছে। তিন গুচ্ছ ফলক এর মধ্যে রেখে বাক্সটিকে মাটির তলায় রাখা হয়েছিল।

অনেক তাম্রশাসনই তাদের জারি করা স্থান থেকে দূরে কোথাও পাওয়া গেছে। বৈদ্যদেবের কমৌলি শাসনে বস্তুতঃ অসমের এক শাসক দ্বারা এক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করাহয়েছে। কিন্তু এই প্লেটটি বারাণসীর এক স্থান থেকে পাওয়া গেছে। সম্ভবতঃ দানপ্রাপক বা তাঁর কোনো উত্তরসূরী পরবর্তীকালে বারাণসীতে বসবাস করতেন, অথবা এটা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না যে দানপ্রাপক আদৌ দানটি ভোগ করেছেন কি না বা তা বিক্রি করে দিয়েছেন কি না। এও হতে পারে যে তিনি বারাণসীতে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন ও মূল্যবান দানপত্রটিকে সঙ্গে নিয়েছিলেন, তারপর সেখানেই হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়।

তাম্রশাসনগুলি খোদাই করার আগে যেসব ক্ষণস্থায়ী জিনিসে তার খসড়া লেখা

Scanned with CamScanner

হত, সেই নথি রাজার কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকত। রাজকীয় দপ্তরে থাকা এই তাম্রশাসনগুলির সংরক্ষক রূপে **অক্ষপটলিক** এর কথা প্রায়শই অভিলেখে পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন অক্ষপটলিক হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন আবার কেউ বলেন নথি সংরক্ষকের। তবে অক্ষপটলিক এই উভয় কাজই করতেন বলে মনে হয়। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের একটি নাসিক অভিলেখে রাজার অক্ষপটল এর মূল সংরক্ষণশালাটিকে **ফলক-বার** (the store house of plates)বলা হয়েছে। ওড়িশার ভৌমকরদের অভিলেখে শাসনের নথি সংরক্ষককে **পুস্তপাল** বা **পুস্তকপাল** (the keeper of books, i.e. records) বলা হয়েছে। এই অঞ্চলেরই অন্য অভিলেখে সংরক্ষককে **পেটপাল, পেট্টপাল, পেডাপাল** (the keeper of the boxes containing records) ইত্যাদি অভিধা দেওয়া হয়েছে। এরা সাধারণতঃ পুস্তপালের অধীনে কাজ করত।

Scanned with CamScanner